গার্ডিয়ানশিপ

(সন্তান প্রতিপালনে অভিভাবকদের করণীয়)

নজরুল ইসলাম টিপু

গার্ডিয়ান
পাবলিকেশনস

ভূমিকা

বাংলায় আমরা যাকে মানুষ হিসেবে চিনি ও বুঝি, পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষা-সাহিত্যে তাকে ভিন্ন নামে ডাকা হয়। যেমন : ফ্রেঞ্চ ভাষায় ঐঁসধরহ, ইংরেজিতে ঐঁসধহ, আরবিতে 'ইনসান' আর বাংলায় মানুষ। এই শব্দগুলোর প্রয়োগ দ্বারা আমরা মানুষের অবয়ব বুঝে থাকলেও ভাষা ভেদে এগুলোর ব্যাখ্যার যথেষ্ট তারতম্য আছে। যেমন : বাংলায় মানুষ শব্দের উৎপত্তি সংস্কৃত 'মনুষ্য' থেকে এসেছে। 'মনুষ্য' শব্দের ব্যাখ্যা হলো—হিন্দু পৌরাণিকের ঋষি মনুর সন্তান। ভিন্ন ব্যাখ্যায়—সেই প্রাণী, যার মন আছে। অন্য ব্যাখ্যায়, আত্মমর্যাদাসম্পন্ন বিবেকবোধ প্রাণীর নামই মানুষ। সেভাবে ফ্রেঞ্চ-এর ঐঁসধরহ আর ইংরেজির ঐঁসধহ সম্পর্কে আলাদা ব্যাখ্যা আছে।

মানুষ সম্পর্কে বিস্তারিত সুন্দর ব্যাখ্যা দেওয়া আছে আরবি ভাষায়। সেটা একেবারেই ভিন্ন এবং এতে বিশ্লেষণের খোরাক রয়েছে। আরবিতে মানুষ শব্দের অর্থ 'ইনসান'। শব্দটি আরবি 'নাসইউন' ধাতু থেকে সৃষ্ট—যার প্রকৃত অর্থ হলো 'ভুল করা' কিংবা 'ভুলে যাওয়া'। বিস্তারিত অর্থে—এমন সৃষ্টি, যে বারবার ভুলে যায় অথবা পদে পদে ভুল করে, তার নামই মানুষ। পবিত্র কুরআনে 'ইনসান' নামে একটি সূরা-ই রয়েছে। সেই সূরায় খুবই আকর্ষণীয়ভাবে মানুষের পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে এবং মানুষের জন্য আগে থেকেই প্রস্তুত করা নিয়ামতের কথা আবারও শোনানো হয়েছে। কুরআন-হাদিসের ছত্রে ছত্রে মানুষকে মনে করিয়ে দেওয়ার অগণিত উপমা রয়েছে।

এই বইটি লেখা হয়েছে মানুষকে কেন্দ্র করেই। তাই সংগত কারণে আমিও 'ভুলে যাওয়া' কিংবা 'ভুল করা' শব্দটিকেই মানুষকে বিবেচনা করার জন্য যথার্থ হিসেবে নিয়েছি। পৃথিবীর সকল প্রাণীর সৃষ্টির পদ্ধতি এক নিয়মে হয়েছে, আর মানুষের সৃষ্টির পদ্ধতি হয়েছে ভিন্ন নিয়মে। তাই মানুষের জীবন-বৈচিত্র্য বিবেচনা করার ক্ষেত্রে অন্য প্রাণীদের সৃষ্টি, বিবর্তনকে মিলিয়ে দেখতে গেলে গোঁজামিল পাকানো সুনিশ্চিত হয়ে পড়ে। মানুষের চরিত্র-ইচ্ছা-অভিলাষকে তার মতো করে আলাদাভাবেই বিচার-বিশ্লেষণ করতে হবে। এই বইয়ে সেই পার্থক্যগুলো খুঁটিনাটি বিস্তারিত তুলে আনার চেষ্টা করা হয়েছে।

কোনো ব্যক্তির পিঠের ওপর দিয়ে সড়সড় করে কিছু একটা হেঁটে গেলে 'ওরে বাবারে!' বলে চিল্লিয়েই লাফ দেবে। জিনিসটা কী, সেটা না দেখা পর্যন্ত মানুষ করণীয় ঠিক করতে পারে না।

নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে দেখতে চাইবে, জিনিসটা মূলত কী ছিল? দেখার পরে নিজের অজান্তে বলে উঠবে—'আরে ধ্যাত! এটা তো টিকটিকি!' কিন্তু প্রাণীরা এক্ষেত্রে একটু ভিন্ন আচরণ করে। তারাও নিরাপত্তার জন্য লাফ দেবে বটে, কিন্তু শূন্যে থাকতেই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলবে—কী তার করণীয়। শূন্য থেকে মাটিতে পড়ার সাথে সাথেই ওটাকে প্রতিহত করার প্রস্তুতি সেরে ফেলবে। পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করে হয়তো তাকে উলটো আক্রমণ করবে; নতুবা পালাবে। কেননা, শত্রুকে চেনা, তাকে আক্রমণ করা এবং আত্মরক্ষার কৌশলগত জ্ঞান তার মগজে জন্মের সময়েই ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। সৃষ্টির সকল প্রাণীই এমন বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। কিন্তু মানুষের কাছে এই দক্ষতা ও বৈশিষ্ট্য জন্মগতভাবে থাকে না; তাকে এটা দুনিয়ার সমস্যা ও উপকরণ থেকেই অর্জন করতে হয়।

প্রাণীরা তার নিজস্ব পরিমণ্ডলের শত্রু সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। আত্মরক্ষা কিংবা কাউকে ঘায়েল করার জন্য তার শরীরে কী কী যন্ত্রপাতি আছে, সে সম্পর্কে সে জানে। কোন ধরনের প্রাণীর কাছে তার যন্ত্রপাতি অকার্যকর, সে ব্যাপারেও তারা ধারণা রাখে। সাপ কীভাবে আক্রমণ করে কিংবা তাকে কীভাবে প্রতিহত করা যায়, কুমিরের দেহের দুর্বল স্থান কোনটি, সবল অংশের ক্ষমতা কেমন ইত্যাদি বিষয়ে তারা জন্ম থেকেই প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হয়। পিঁপড়া দাঁত দিয়ে আক্রমণ করে, কিন্তু ভোমরা আক্রমণ করে হুল দিয়ে। বোলতার বাসায় হানা দেওয়া নিরর্থক, কিন্তু মৌচাকে ঝুঁকি নেওয়াও লাভজনক। ইগলের সাথে লড়তে যাওয়া মানে নির্ঘাত মৃত্যু, কিন্তু তার সৎভাই শকুনকে গুঁতো দিলেও জীবিত প্রাণীতে তার আগ্রহ নেই। পেটের ব্যথায় কোন ঘাস খেতে হবে এবং কোন গাছের ফল খাওয়া অনুচিত, সকল তথ্যই প্রাণীদের মগজে জন্মগতভাবেই ঢুকিয়ে দেওয়া আছে। তাই তাদের দুনিয়ার জীবনে চলাফেরার জন্য কোনো বিদ্যালয়ে যেতে হয় না। কোনো ওস্তাদ ধরতে হয় না। এমনকী তাদের মাতা-পিতাকেও তাদের শিক্ষার জন্য দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হতে হয় না। ব্যক্তিগত উদ্যোগে যোগ্যতা বাড়ানোর জন্যও কোনো আলাদা বিষয়ে প্রশিক্ষণ নেওয়ার গরজ বোধ করে না তারা। এমনকী প্রাণীদের একটি শিশু বাচ্চাও নিজের জীবন কীভাবে পরিচালনা করতে হবে—সে জ্ঞান রাখে।

কিন্তু মানুষের সৃষ্টি-বিন্যাস সম্পূর্ণরূপেই ভিন্ন। শারীরিক ও মানসিক দিক থেকেও মানুষ পৃথিবীর অন্যান্য সৃষ্টির মতো নয়। এই বইয়ে মানুষ সৃষ্টির এমনই কিছু চিত্তাকর্ষক ঘটনা তুলে আনা হয়েছে। মানুষকে এই পৃথিবীর উপায়-উপকরণ ব্যবহার করেই শিখতে হয়। ধীরে ধীরে দক্ষতা, অভিজ্ঞতা অর্জন করেই পূর্ণাঙ্গ মানুষ হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলতে হয়। এতটুকুর মধ্যে মানুষের জীবন সীমাবদ্ধ থাকলে একটি বুদ্ধিমান প্রাণী হিসেবে খ্যাতি লাভ করা ছাড়া ওপরে বর্ণিত প্রাণীর জীবনের মধ্যে কোনো তফাত থাকবে না। মানবশিশুকে চিন্তা করে আবিষ্কার করতে হয়। সৃষ্টির মধ্যে সে-ই একমাত্র ব্যতিক্রম। তার জন্ম, শৈশব, কৈশোর, শিক্ষা, চালচলন, পোশাকের ব্যবহার, খাদ্য গ্রহণে রন্ধন প্রণালির সুযোগ গ্রহণসহ প্রতিটি ধাপেই ব্যতিক্রম আর ভিন্নতায় ভরা। দুই পায়ে দাঁড়িয়েও সে পৃথিবীর সবচেয়ে ক্ষমতাবান ও ভিন্নধর্মী এক বিরল সৃষ্টি! এত ভিন্নতা দেখেও যার জ্ঞানের মধ্যে

কোনো আলোড়ন হয় না কিংবা ভাবের লেশমাত্র সৃষ্টি হয় না, সে অর্থেই মানুষের প্রকৃত পরিচয় তথা 'ভুলে যাওয়া' কথাটি যথার্থ।

মানুষ ভুল করে। এই ভুলে যাওয়ার প্রবণতা মানুষের দোষ নয়। সে কোথায় ভুল করেছে—এটা নির্ধারণ করাও অনেক সময় তার জন্য কষ্টসাধ্য হয়ে ওঠে। পদে পদে ভুল করা মানুষের স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্যের অন্যতম দিক। আল্লাহ নিজেই বলেছেন—

'মানুষ সৃষ্টিগতভাবেই দুর্বল।' সূরা নিসা : ২৮

এই দুর্বল প্রবণতার কারণে মানুষ বারবার ভুলে যায়। তা ছাড়া মানুষের এই দুর্বলতার কথা তো আল্লাহ নিজেই জানেন। তাই মানুষ যাতে পথভ্রষ্ট না হয়, সেজন্য তাদের তাগিদ দিতে, বারবার মনে করিয়ে দিতে দুনিয়াতে অসংখ্য নবি-রাসূল পাঠিয়েছেন। আসমানি কিতাব পাঠিয়েছেন। বছরে ঈদ, কুরবানি, রোজার ব্যবস্থা করেছেন। প্রতিদিন যথাসময়ে কল্যাণের কাজে দ্রুত ফিরে আসার জন্য আজানের মাধ্যমে মানুষকে মনে করিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন।

ঠিক সেভাবে সন্তানকে চরিত্রবান বানানো, ধৈর্যশীল, জ্ঞানী, প্রজ্ঞাবান হিসেবে গড়ে তোলার জন্যও তাদের মনে করিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন হয়। একজন শ্রেষ্ঠ মানুষ তৈরি করতে, দুনিয়ার জীবনের বুৎপত্তি অর্জন করতে, জীবনযাপনের প্রতি পদে পদে সন্তানকে মনে করিয়ে দেওয়ার এই অনুশীলন অব্যাহত রাখতে হয়। সেজন্য অভিভাবকদেরও সকল পদ্ধতি ও ধাপগুলো মনে রাখতে হয়। একটি শিশুকে মানুষ বানানোর জন্য শিশুদের করণীয় কিছু নেই, কিন্তু অভিভাবকদের অনেক করণীয় আছে। সেগুলোই এই বইতে সবিস্তারে বর্ণনা করা হয়েছে—যাতে করে আমাদের সন্তান একজন মানুষ হতে পারে এবং সেইসঙ্গে সফল ক্যারিয়ারের অধিকারীও হতে পারে।

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

মানুষ হওয়ার গুরুত্ব

শিশুর অলৌকিক জীবন ১৭
মাতৃজঠর থেকে দুনিয়ার পথে ২০
দুনিয়াবি যোগ্যতা অর্জনের ধাপসমূহ ২৫
মাটির মানুষ ৩০
শিশুর ভাষা শিক্ষার আকর্ষণীয় পর্যায় ৪০
শিশুর জীবনে নাম; মানুষ হওয়ার প্রথম উপাদান ৪৪
কর্মের ওপর নামের প্রভাব ৪৭
সন্তানের যে প্রশ্নের মোকাবিলা করতেই হয় ৫১
শিশুর মানবীয় গুণাবলি বিকাশ ৫৪
শিশুজীবনে আত্মবিশ্বাসের গুরুত্ব ৫৭

দ্বিতীয় অধ্যায়

শিক্ষার মূল উপাদান

মানবজীবনে শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ও তার উপাদান ৬৩
সুখী জীবন, তৃপ্ত মন ও শান্ত আত্মা শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য ৬৬
শিশুদের জীবনে উত্তম পরিবেশের প্রভাব ৭১
শিশুদের দৃষ্টিকে বইমুখী করানোর উপায় ৭৩
বই পড়াতে হবে কেন ৭৭
ভাবনার শক্তি শিশুকে বিচক্ষণ ও দূরদর্শী বানায় ৭৯
শিশু যখন গল্প শুনতে চায় ৮২
শিশুর কল্পনাবাজি ৮৫
স্বপ্ন দেখার পরিবেশ ৮৯
শ্রেষ্ঠ সন্তান বানাতে ধৈর্যশীলতা ৯৮

তৃতীয় অধ্যায়

সামাজিক শিশু গঠন

শিশুকে সামাজিক বানানোর গুরুত্ব	১০৫
পাঠের মাধ্যমে শিশুদের সামাজিক বানানো	১১২
শিশুর জন্য ইতিবাচক প্রেরণা	১১৮
আদর, আবদার ও অধিকারের সমন্বয়	১২৫
কৃতজ্ঞতার শিক্ষা	১২৯
সৎ স্বভাব নিয়ে সকল শিশুর জন্ম	১৩৭

চতুর্থ অধ্যায়

আদর্শ মানুষ তৈরি

সোনার মানুষ বানানোর হাতিয়ার	১৪১
সন্তানকে জ্ঞানী ও সৃজনশীল বানানোর সেরা উপায়	১৪৫
নম্রতার শিক্ষা	১৫৩
নম্র, ভদ্র, শান্ত স্বভাবের শিশু তৈরি	১৫৬
শিশুকে মসজিদমুখী করার গুরুত্ব	১৬২

পঞ্চম অধ্যায়

অভিভাবকদের করণীয়

অভিভাবকদের দুর্বলতা	১৬৯
কঠোর চিত্তের সন্তানের কুফল	১৭৭
যে চরিত্রের কারণে পিতা-মাতা বিব্রত হয়	১৮১
পরনির্ভরশীলতার কুফল	১৮৬
বদনজর ও জিনের আছর থেকে সাবধানতা	১৯১

ষষ্ঠ অধ্যায়

বিশেষ দৃষ্টিপাত

বন্ধু নির্বাচন	১৯৯
খারাপ বন্ধুর সঙ্গদোষ ও পরিণতি	২০৮
যৌন অনুভূতির সময়কাল	২১১
সফল গার্ডিয়ান হতে করণীয়	২১৮

শিশুর অলৌকিক জীবন

চরম ভাগ্যবান শিশু

পৃথিবীতে জন্ম নেওয়া প্রতিটি মানবসন্তানই মহা ভাগ্যবান। বাবার পৃষ্ঠদেশের নিক্ষিপ্ত পানির বিন্দু থেকে কোটি কোটি অজানা ভাই-বোনের সাথে মরণপণ প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়েই দুনিয়ার মাটিতে মানুষের পদার্পণ হয়েছে। জীবনের শুরুতে কোনো মানব সন্তানেরই দৃশ্যমান কোনো অস্তিত্ব থাকে না। শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যেও তার আগমন ও চরিত্র সম্পর্কে কোনো ধারণা পাওয়া যায় না। সেই আণুবীক্ষণিক সচল বিন্দুগুলোর মধ্যে যারা আজ বিশাল মানুষ হয়ে পৃথিবীতে বিচরণ করছে, জ্ঞান অন্বেষণ করছে, তারা আর কেউ নয়, আমরাই সেই ভাগ্যবান ব্যক্তি। পবিত্র কুরআনে এই কথাটিকে এভাবেই তুলে আনা হয়েছে—

> ‘মানুষের ওপরে কি অন্তহীন মহাকালের এমন একটি সময়ও অতিবাহিত হয়েছে, যখন সে উল্লেখযোগ্য কোনো জিনিসই ছিল না?’ সূরা ইনসান : ১

পৃথিবীতে আগমন আত্মহত্যার তরে নয়

পৃথিবীর বেশিরভাগ মানুষ নিজেকে ভাগ্যহত মনে করে। এজন্য কেউ কেউ আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়! খুব কমসংখ্যক মানুষই দুনিয়াতে আসতে পেরে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করে। আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ হয়। দুনিয়ার যত নয়নাভিরাম দৃশ্য, বিশ্বজগতের ছবি; সকল সৃষ্টির মধ্যে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ পায়। এদিকে থেকে মানুষ ভাগ্যবান। আর এজন্য তারা আল্লাহর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করবে—এমনটাই আল্লাহ প্রত্যাশা করেন। বাস্তব দুনিয়ার এই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ মানুষকে তাদের আদি ঠিকানা জান্নাতে পৌঁছে দেবে। মানুষের কাছে যতক্ষণ এই জ্ঞান না থাকবে, ততক্ষণ সে তার মূল্য বুঝবে না। সে নিজেকে পৃথিবীর সবচেয়ে অনাথ, অভাগা মনে করেই জীবনের ইতি টানবে।

সবাই ভাগ্যবান

আমরা প্রত্যেকে শিশু ছিলাম, তার আগে ছিলাম মায়ের উদরে। মায়ের উদরে নিক্ষিপ্ত হওয়ার প্রায় ৭০ দিনের মাথায় আমাদের তাকদির ঘোষণা করা হয়েছিল। নাম, বয়স, দুনিয়ার জীবনের বুৎপত্তি, সক্ষমতার পরিধি, খ্যাতির পর্যায়—সবই লেখা হয়েছিল। পৃথিবীর জীবন পাড়ি দিতে এটাই তার জন্য বরাদ্দ। যাকে দুনিয়াতে আসার জন্য বাছাই করা হয়, তাকে স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি দেওয়া হয়। দেওয়া হয় নিজের মতো করে সিদ্ধান্ত গ্রহণের যোগ্যতা। অতঃপর পানিতে বিক্ষিপ্তভাবে ভাসমান সেই সচল বিন্দুর মাঝে মানব-প্রাণের সঞ্চার হওয়ার জন্য নির্দেশ আসে। তখন থেকে সে একজন মানুষ হিসেবে খাতায় লিপিবদ্ধ হয়। জীবন শুরুর এই ঘটনাটিকে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে—

> ‘প্রাণের সৃষ্টি হয়েছে পানি থেকে।’ সূরা ফুরকান : ৫৪

মাতৃজঠর থেকে দুনিয়ার পথে

আমি, আপনি, সবাই একসময় শিশু ছিলাম। শিশু বয়সে বহু ধরনের খেলায় আত্মনিয়োগ করেছি। দুনিয়াতে আসার আগে মায়ের পেটে থাকার সময়ও নানাভাবে খেলেছি! সেসবের কোনো কিছুই এখন মনে নেই। মানব-প্রকৃতি এমন। এসব কারও মনে থাকে না। মায়ের পেটের ছোট্ট কুঠুরিতেই একটি শিশু অর্জন করে ফেলে—সে কীভাবে দুনিয়ায় জীবনযাপন করবে। সেখান থেকেই সে নানাবিধ সক্ষমতা অর্জন করে। এই কর্মের সক্ষমতা অর্জন তার ইচ্ছাশক্তির কারণে হয় না। এটা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের এমন ম্যাকানিজমের ফল। মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে আমাদের এসব তথ্য জানিয়ে দিয়েছেন। তা ছাড়া বিজ্ঞানের কল্যাণে মানুষ সেটা বাস্তব চোখে দেখার সুযোগও পাচ্ছে।

গর্ভাবস্থায় শিশুর অলৌকিক জীবনের শুরু

গর্ভের শিশু দুনিয়াতে এসে জীবন ধারণের জন্য প্রথম যে যোগ্যতাটি অর্জন করে, তা হলো—শ্রবণশক্তি। জন্মের ছয় সপ্তাহ আগ থেকেই শিশু মায়ের পেট থেকে সব শুনতে পায়। সে বাইরের প্রতিটি শব্দের প্রতি মনোযোগী হয়। মায়ের কণ্ঠ পুরোপুরি চিনতে পারে! এমনকী মা কারও সাথে যখন উচ্চৈঃস্বরে কথা বলে, তর্ক করে, গান গায়, টিভি দেখে কিংবা পবিত্র কুরআন পড়ে, শিশুটিও তখন গর্ভ থেকে তার মায়ের মতো উপভোগ করে। অতঃপর মায়ের অন্তরঙ্গ যারা, যেমন : পিতা, ভাই, বোন প্রমুখদের কণ্ঠও গর্ভের শিশু পরিষ্কারভাবে আলাদা করতে পারে। দুনিয়াতে আসার পর মা যখন শিশুকে ডাক দেয়, সাথে সাথেই সে হাত-পা নেড়ে উল্লাস প্রকাশ করে। আল্লাহ পবিত্র কুরআনে শিশুর এই যোগ্যতার দিকে লক্ষ করে বলেছেন—

> ‘আমি তাকে শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তির অধিকারী করেছি।’ সূরা ইনসান : ২

লক্ষণীয় বিষয়, শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তির কথাটি পবিত্র কুরআনে চার বার এসেছে। তিন জায়গায় আগে শ্রবণশক্তি এবং পরে দৃষ্টিশক্তির কথা উল্লেখ হয়েছে। এক জায়গায় মানুষ থেকে শক্তি কেড়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে প্রথমে দৃষ্টি, পরে শ্রবণশক্তির কথা বলা হয়েছে। এখান থেকেই মানুষের শ্রবণশক্তির গুরুত্ব বোঝা যায়। মূলত একজন অন্ধ মানুষের চেয়েও বেশি অসহায় একজন বধির মানুষ! আর দুনিয়ার জীবনে যে বেশি শোনে, সে জানে বেশি। মন দিয়ে শোনায় অভ্যস্ত মানুষ জ্ঞানী হয়, বেশি বলায় অভ্যস্ত মানুষ বাচাল হয়। জীবনে চলার পথে মানুষ সেই কথাটিই বলে, যা যে শুনেছে। একবার বলা হয়ে গেলে কথাটি পুরোনো হয়ে যায়। তাই নতুন করে তাকে শুনতে হয়। এজন্য বিজ্ঞতা বৃদ্ধির জন্য মানব সন্তানের শোনার কোনো বিকল্প নেই।

বিজ্ঞানের কল্যাণে আজ আমরা জানতে পারছি, শিশুরা মায়ের পেটের ভেতরে বসেই বাইরের সব শুনতে পায়। এর দ্বারা বোঝা যায়—দুনিয়ার জীবনে এসে শিশু প্রথম কোন জিনিসটার দ্বারা বেশি প্রভাবিত হবে, সে ব্যাপারটি গর্ভে থাকাকালীন সময়েই প্রায় সুনিশ্চিত হয়ে যায়। ফলে গর্ভের শিশু কী কী শুনে দুনিয়া পর্যন্ত পৌঁছেছে, তার একটি প্রভাব শিশুর সারা জীবনে জড়িয়ে থাকে।

সন্তানের শরীরে মায়ের স্পর্শ

মায়ের পেটে থাকাবস্থায় শেষ কয়েক সপ্তাহ শিশু রীতিমতো ফুটবল খেলোয়াড়ের মতো চঞ্চল থাকে। তার ক্ষুদ্র লাথিতে মায়ের কলিজা পর্যন্ত আঘাতপ্রাপ্ত হলেও সে কিন্তু মায়ের স্পর্শের জন্য হাহাকার করতে থাকে। পৃথিবীতে আসার পরক্ষণেই অগণিত মানুষের স্পর্শের মধ্যে মায়ের স্পর্শকে সে আলাদা করে চিনতে পারে। যতক্ষণ মায়ের সোহাগ না পায়, ততক্ষণ সে ফোঁপাতে থাকে; অতঃপর মায়ের স্পর্শেই সেই কান্না থেমে যায়। বস্তুত গর্ভাবস্থায় শিশু দ্বিতীয় যে যোগ্যতাটি অর্জন করে, তা হলো—স্পর্শের ক্ষমতা।

সদ্যজাত শিশুর জীবনে মায়ের চুমু, স্পর্শ ও আদর অবিশ্বাস্য রকমের শক্তি সৃষ্টি করে। তার প্রাণশক্তিকে বাড়িয়ে তোলে এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে দেয়। অনুভূতির কথা শিশু হয়তো বলতে পারে না, কিন্তু বিজ্ঞান আজ বারংবার শিশুর জীবনের এই মহা ধাপগুলোর কথা প্রমাণ করে যাচ্ছে। আমরা যদি প্রাণিকুলের প্রতি তাকাই, তাহলে দেখব—মা প্রাণী তার সন্তানের প্রতি কী গভীর ভূমিকা রেখে চলছে। সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়ে যখন মাটিতে পড়ে, মা তখন অনেক দুর্বল থাকে। মাটি থেকে উঠার শক্তি হারিয়ে ফেলে। কিন্তু প্রিয় সন্তানকে আদর করার জন্য মায়ের ঠোঁট দুটো থিরথির করে কাঁপতে থাকে! সন্তানকে মাটিতে হেঁচড়াতে দেখা মাত্রই মায়ের শরীরে হারানো বল ফিরে আসে। তড়াৎ করে লাফিয়ে উঠে নিজের জিহ্বা দিয়ে সন্তানের দেহ চাটতে থাকে। এতে মা সুখানন্দ পায় আর সন্তান অল্প সময়ের মধ্যেই এই পরিবেশের সাথে মানিয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াতে সক্ষম হয়। একটু পরেই সে হাঁটতে পারে এবং নিজের ওপর অটুট আত্মবিশ্বাস চলে আসে। সন্তানকে চুমুর গুরুত্ব প্রাণিকুল বোঝে না, কিন্তু সেটাই সন্তানদের জন্য অপরিহার্য। তাই আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সন্তানের সাথে মায়ের স্পর্শ করিয়ে দেওয়ার এই পদ্ধতির চিন্তা তাদের মাথায় ঢুকিয়ে দিয়েছে। পৃথিবীর সকল প্রাণীর মায়েরা সদ্যজাত শিশুসন্তানকে এভাবেই আদর করে। পৃথিবীর জীবনে সুস্থ-সবলভাবে চলতে হলে মানবজীবনেও মায়ের আদরের কোনো বিকল্প নেই। আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের রীতি অনুযায়ী ভূমিষ্ঠ সন্তানকে প্রথমেই তার মায়ের পরশ লাগানো হয়। এতে সন্তান অনেকাংশে শান্ত থাকে।

শ্রেষ্ঠ সন্তান বানাতে ধৈর্যশীলতা

বরশি পানিতে ফেলে মাছের খোঁটের আশায় একনিষ্ঠ চিত্তে দীর্ঘ অপেক্ষায় বসে থাকার নাম ধৈর্য নয়। আবার কিছু না করে জীবনের একটি মোক্ষম সুযোগ কবে আসবে তার অপেক্ষায় বসে থাকার নামও ধৈর্য নয়। ধৈর্য হলো প্রকৃত সফলতা না আসা পর্যন্ত একনিষ্ঠ মনে, এক ধ্যানে চেষ্টা-প্রচেষ্টায় লেগে থাকা। জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ও বহুল আকাঙ্ক্ষিত কিছু একটার অভাবই মানুষকে ধৈর্যশীল বানায়। শিশুদের কোনো আবদার চাওয়া মাত্রই পূরণ করতে নেই। চাওয়া-পাওয়ার এই হিস্‌সার মাঝেই শিশুদের ধৈর্য ধরার চরিত্র গড়ে তুলতে হয়। আর যদি তা করা না হয়, তাহলে শিশু কোনোদিনই ধৈর্যশীল হয় না। পিতা-মাতার জন্য অচিরেই সে বোঝা হয়ে উঠবে। চাওয়া ও পাওয়ার মাঝে নাটকীয়তা তৈরি করতে হয়। শিশু যাতে উপলব্ধি করতে পারে, এই পাওয়াটা অনেক কষ্ট করে অর্জিত হয়েছে।

অনাথ শিশু যেভাবে মহাযুদ্ধের নায়ক

এই পৃথিবীর যত অভিনবত্ব, যত আবিষ্কার, তার সবকিছুই একদল ধৈর্যশীল মানুষের হাতে হয়েছে। শিক্ষিত কিংবা অশিক্ষিত, ধনী কিংবা দরিদ্র যেকোনো ব্যক্তিই যদি ধৈর্যশীল হয়, তাহলে তার জীবনে চরম সাফল্য আসবেই। হিটলারকে আমরা একনায়ক হিসেবেই চিনি, কিন্তু সে ছিল ধৈর্য ধরার এক চূড়ান্ত প্রতীক। রাস্তায় রুটি কুড়িয়ে নিঃস্ব যে ছেলেটি জীবনধারণ করত, একটি টাকার জন্য দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়াত, সেই ছেলেটিই একদিন সেনাবাহিনীতে যোগ দেয়। একপর্যায়ে সে গুরুত্বপূর্ণ অফিসার হয়ে ওঠে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধপরবর্তী জার্মানে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। রাশিয়া ও জার্মানে ইহুদিদের ব্যাপক প্রভাব বাড়তে থাকে। জার্মানির ব্যাবসা-বাণিজ্য, শেয়ার বাজার, শ্রমবাজার ইহুদিদের নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। কারণ, ইহুদিরা অনেক অনেক দক্ষ ও সুচতুর, এসব কাজে সারা বিশ্বে তারা চৌকশ। এদিকে দুর্ভিক্ষে সারা জার্মানি পঙ্গুপ্রায়। হিটলার ভাবে—এভাবে চলতে দেওয়া যায় না। তাই সে সেনা অভ্যুত্থান ঘটিয়ে বসে, কিন্তু সেই পদ্ধতিতে জনমত আদায় করতে ব্যর্থ হয়। তাই তাকে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হতে হয়।

এরপর সে নতুন করে ভাবতে শুরু করে। বুঝতে পারে—রাষ্ট্রনায়ক হতে হলে, জনগণকে কাছে পেতে হলে, তাদের দৃষ্টি আবদ্ধ করতে হলে, তাকে সমাজ, রাষ্ট্র, কূটনীতি প্রভৃতি সম্পর্কে প্রচুর বই পড়তে হবে। তাই নতুন যাত্রা শুরু করে সে। বিশ্বসাহিত্যের বইয়ের ভান্ডারে 'ঢু' মারে হিটলার। শত শত বই অধ্যয়ন করার পরে বুঝতে পারে, মানুষের নেতা হতে হলে কোন উপায়ে এগোতে

হয়। সেভাবেই সে এগোয়। এরপর একদিন জাতীয় নির্বাচনে বিপুল ভোটে জিতে যায় এবং জার্মানির অবিসংবাদিত নেতা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

হিটলার বুঝতে পারে—জনগণের ওপর দুর্ভিক্ষ, খবরদারি, অন্যায় আচরণ কোনো দুর্ভাগ্যের কারণে হয়নি; বরং অন্যায়কারীর আচরণের কারণেই হয়েছে। তাই অন্যায়ের শিকড় উপড়ে ফেলতে আরেকটি যুদ্ধের দরকার। জাতির সকল মানুষকে তার চিন্তাধারা সম্পর্কে বোঝাতে সক্ষম হয়। যে দেশ মাত্র ২০ বছর আগেও (১৯১৯ সালে) বিশ্বযুদ্ধে চরমভাবে পরাজিত, পর্যুদস্ত ও বিপর্যস্ত হয়েছিল, মাত্র ২০ বছরের মাথায় সেই দেশকে সে বিশ্বশক্তিতে রূপান্তরিত করে তোলে। অন্যায়ের প্রতিবাদে ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নেতৃত্ব দেয়। যদিও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভিলেন হিসেবে তাকে চিত্রায়িত করা হয়, কিন্তু সে যদি যুদ্ধে জিতে যেত, তাহলে ইতিহাস অন্যভাবে লেখা হতো। কেননা, যুদ্ধের ইতিহাস এমনই—যারা জিতে যায়, তাদের পক্ষেই ইতিহাস রচিত হয়। যাইহোক, ধুলোয় ভূলুণ্ঠিত একটি জাতিকে সংক্ষিপ্ত সময়ে আবারও ঘুরে দাঁড়াতে শিখিয়েছিল এই ব্যক্তি। হিটলারের এই প্রবল মনোবল ও বিপুল শক্তি সৃষ্টি হয়েছিল কেবল তার একনিষ্ঠ ধৈর্যের কারণেই।

ধৈর্যশীলতার গুণে দুনিয়া আলোকিত

কল্পিত চিন্তায় যুবকের মনে দৃঢ়তা এসেছিল, বিদ্যুৎ দিয়ে বাতি জ্বালানো যাবে। একে একে ৮২টি পরীক্ষায় ব্যর্থ হওয়ার পর বন্ধুরা বলল—'ব্যস! যথেষ্ট হয়েছে, এবার ছাড়ো! এত পরীক্ষার পরও যখন ব্যর্থতা থেকে উঠতে পারলে না, তার মানে বুঝতেই পারছ, বিদ্যুতের মাধ্যমে কোনোদিন বাতি জ্বালানো যাবে না।'

উত্তরে যুবক বলেছিল—'শুনে রাখো! আমি ৮২টি পরীক্ষার কোনোটাতেই ব্যর্থ হয়নি; বরং এই সব ব্যর্থ পরীক্ষার মাধ্যমে নিশ্চিত হতে পেরেছি—আমি যা সৃষ্টি করতে চাচ্ছি, তা এসব জিনিস দিয়ে হবে না।'

কত ভয়ানক মনোবল! এভাবে নিজের লক্ষ্য ও চিন্তা-কল্পনার কাছে হার না মানা অকল্পনীয় ধৈর্যশক্তিসম্পন্ন মেধাবী ব্যক্তিটির নাম টমাস আলভা এডিসন। দুনিয়াতে বহু মানুষ প্রথমবার ব্যর্থ হয়েই হাল ছেড়ে দিয়ে ঘোষণা করে—সে ব্যর্থ হয়েছে, এই পথে সে দ্বিতীয়বার পা দেবে না। কিন্তু এডিসন আরও বহু পরীক্ষার মাধ্যমে অবশেষে বৈদ্যুতিক বাতি জ্বালাতে পেরেছিলেন। আজ পুরো দুনিয়া বৈদ্যুতিক আলোর মাধ্যমে আলোকিত হয়েছে, তা এডিসনের এই কীর্তির মাধ্যমেই পাওয়া। এডিসনের যদি ধৈর্যশীলতার গুণ না থাকত, তাহলে বিশ্ববাসীকে আরও বহুকাল অন্ধকারে থাকতে হতো। জীবন চলার পথে যেকোনো একটি বিষয়ে মানুষ যদি ধৈর্যের সাথে লেগে থাকে, সে সফল হবেই।

শিশুকে সামাজিক বানানোর গুরুত্ব

সমাজের যাত্রা শুরু নিজের ঘর থেকেই

সমাজ ও সামাজিকতা যা-ই বলা হোক না কেন, এটার মূল প্রাণশক্তি নিজের ঘর। নিজের ঘরেই যদি সমাজ ও সামাজিকতার প্রতিচ্ছবি না থাকে, তাহলে সন্তান কোনো অবস্থাতেই সামাজিক হবে না। যে ঘরে তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে মারামারি, ঝগড়াঝাঁটি হয়, তারা কীভাবে একটি সুন্দর সমাজের কথা চিন্তা করতে পারে? চাকরানির হাত থেকে পড়ে যাওয়া বাটির ভাঙা অংশ নিয়ে তাদের গায়ে হাত তোলে, মহাহাঙ্গামা ঘটায়। নিজেদের ঘর থেকে হাই ভলিউমে গান বাজিয়ে প্রতিবেশীর জীবনযাত্রাকে অতিষ্ঠ করে তোলে। বিয়ের অনুষ্ঠানের দোহাই দিয়ে উচ্চৈঃস্বরে মাইক বাজিয়ে সারা মহল্লা কাঁপিয়ে তোলে। এসব মানুষ সমাজের প্রতিনিধি হলেও তারা কখনো সামাজিক মানুষ হয়ে উঠতে পারে না। সামাজিকতার মূলমন্ত্রই হলো সৌম্য, শান্তি, সৌহার্দ্য, পরমত সহিষ্ণুতা এবং অন্যের অধিকারের প্রতি সম্মান জানানো। যারা নিজেদের আচরণে অন্যের শান্তি ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছে কি না—এটা ভাবে না, তাদের ঘরের প্রতিটি সদস্য উচ্চবিত্ত ও শিক্ষিত হলেও তারা সামাজিক হতে পারে না। এরা অন্যের হৃদয়ের অনুভূতি সম্পর্কে সদা উদাসীন থাকবে। একটি সমাজ পরিগঠনের জন্য সামাজিক মূল্যবোধ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল মানুষ চাই। আর এ ধরনের মানুষ সৃষ্টি হতে পারে সচেতন পরিবারের নৈতিক শিক্ষা থেকে।

ঝগড়াটে পরিবেশের শিশুরা

বর্তমান সময়ে পারিবারিক অশান্তি অন্যান্য সকল যুগের চেয়ে বেশি। স্বামী-স্ত্রী উচ্চশিক্ষিত হওয়ার পরও একে অন্যকে সম্মান, গুরুত্ব, মূল্য না দেওয়ার কারণে ঘরে ঘরে আগুন ছড়িয়ে পড়েছে। এই কারণে সংসারে ঝগড়াঝাঁটি লেগেই থাকে। অনেক পরিবারে একে অন্যকে প্রতিহত করতে কখনো হাতাহাতিতে লিপ্ত হয়, মারধরও চলে। বিকল্প হিসেবে কোথাও চলে গালাগালির মহরত। এই ধরনের পরিবারের সন্তানরা অসামাজিক হয়, এসব পরিবারের সদস্যদের সাথে অন্যরা তেমন একটা মেশে না। ভদ্র-সম্ভ্রান্ত পরিবারের মানুষ এদের এড়িয়ে চলে। উভয় শ্রেণিতে শিক্ষিত মানুষ থাকার পরও উভয়ের মধ্য এক অদৃশ্য দেয়াল খাড়া হয়।

এ ধরনের পরিবারের সন্তানরা মনের অশান্তি ভুলে থাকতে মাদক ও যৌনতায় ডুব দেয়। এমন পরিবারের সন্তানরা উচ্চশিক্ষা পেলেও আজীবন মানসিক অশান্তি নিয়েই বেড়ে ওঠে। শিশুকালে

মনমরা জেদি স্বভাব এবং প্রাপ্ত বয়সে গোঁয়ার্তুমি করাই এদের স্থায়ী স্বভাব হয়ে দাঁড়ায়। এরা সামাজিকতার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব কোনোটাই বোঝে না। যেহেতু তারা নিজেদের ঘরে আজীবন অসামাজিকতার প্রভাব দেখেই বড়ো হয়েছে, তাই এভাবে চলাটাকেই জীবন মনে করে এবং এই দূষিত কেন্দ্র থেকেও তারা বের হতে পারে না। তাই সন্তানকে সামাজিক বানাতে হলে আগে নিজের পরিবার-পরিজনকে সামাজিক বানাতে হবে। তারপর অন্যকে প্রভাবিত করার জন্য কাজ করতে হবে।

ইসলাম ধর্মে সামাজিকতার গুরুত্ব

ইসলাম ধর্মের পুরো কনসেপ্টটাই দাঁড়িয়ে আছে সামাজিকতার গুরুত্বের ওপর। একটি সুন্দর স্থিতিশীল, সহযোগিতাপূর্ণ সমাজ গঠনে ইসলাম ধর্মে এত বেশি সতর্ক করা হয়েছে—যা লিখতে গেলে আলাদা একটি বিরাট বই হবে। রাসূল ﷺ মসজিদের ভাষণের সময় প্রতিবেশীর গুরুত্বের প্রতি এত বেশি কথা বলেছেন, যার কারণে সাহাবিরা ভাবত—এক্ষুনি বুঝি নিজের সম্পদ প্রতিবেশীকে দেওয়ার জন্য আদেশ জারি হবে। প্রতিবেশীর প্রতি যত্নশীল ও সতর্ক হওয়ার জন্য উপদেশ দেওয়ার সময় এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করলেন—'হে আল্লাহর রাসূল! প্রতিবেশী কারা?' তিনি উত্তরে বললেন—'তোমার ডানে-বামে ৪০ পরিবার।'

মূলত ডানে-বামের এতগুলো পরিবার নিয়েই তো সমাজের সমষ্টি। কল্পনার রাজ্যে চিন্তা করে দেখা যায়, একজন ব্যক্তিকে সামাজিক হতে হলে কত মানুষের সাথে নিবিড় সম্পর্ক রাখার প্রয়োজন! আমাদের দেশ ঘনবসতির দেশ—এমন দেশেও ডানে-বামে ৪০ পরিবারের একসঙ্গে উপস্থিতি আছে—এমন জনপদটা কোথায়? তারপরও নিকট প্রতিবেশীর প্রতি সহানুভূতিশীল থাকার জন্য আমাদের রাসূল ﷺ ভূমিকাটা কেমন, দেখুন। তিনি বলেছেন—'তোমরা মাংস রান্না করলে তরকারিতে একটু ঝোল বাড়িয়ে দিয়ো, যেন তা থেকে কিছুটা তোমার প্রতিবেশীকে দিতে পারো।'

একজন সাহাবি দাঁড়িয়ে বললেন—'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার কাছে দুজন প্রতিবেশী আছে, কিন্তু শুধু একজনকে দেওয়ার মতো কিছু আছে, তাহলে কাকে অগ্রাধিকার দেবো?'

রাসূল ﷺ বললেন—'তোমার ঘরের দরজার নিকটবর্তী যার ঘরের দরজা।'